যুগান্তর
24-OCT 2013
৫

মোঃ মুজিবুর রহমান

রাজনৈতিক অস্থিরতার কবলে শিক্ষা

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিনিয়ত নানা সমস্যা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। তবে যেভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচি ও অন্যান্য নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে তাতে শিক্ষা এগিয়ে চলেছে বললে বোধ করি কিছুটা ভুল হবে। বরং বলা যায়, শিক্ষাব্যবস্থা এখন একরকম স্থবির হয়ে আছে। শিক্ষার্থীদের জন্য শান্তিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার পরিবর্তে নানা উপায়ে তা বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। স্কুলশিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থাও নির্বিঘ্ন রাখা যাচ্ছে না। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নেই, নেই কোনো মিছিল-মিটিং, ঘেরাও-অবরোধ। এমনকি এখানে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রভাবও নেই। তারপরও স্কুলশিক্ষা কার্যক্রমও বিঘ্নের মুখে পড়ে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক কর্মসূচি ও নানামুখী বেআইনি কর্মকাণ্ডের কারণে।

চলতি বছরের শুরুতেই রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে উপর্যুপরি হরতাল আহ্বান করা হয়েছিল। এ কারণে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটেছে। হরতাল সামনে রেখে কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল তখন। পরীক্ষার্থীরা চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেছে। এমনকি তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও বিঘ্ন ঘটেছে ব্যাপকভাবে। পরীক্ষার সময়টিতে পরীক্ষার্থীরা নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা তা নিয়ে অভিভাবকদের মনে রাজ্যের দুশ্চিন্তা ভর করেছিল। এর পরও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ স্থিতিশীলতা আসেনি; শিক্ষা নিয়েও অনিশ্চয়তা কাটেনি। বছরের মাঝামাঝি রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছুটা স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করার পর এখন আবার দেখা দিয়েছে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা। সচেতন মহল ধারণা করছে, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যদি কোনো সমঝোতা না হয়, তাহলে বছরের শেষভাগেও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপক বিঘ্নের মুখে পড়বে।

সামনে নভেম্বর। এ মাসজুড়ে রয়েছে বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষার বিস্তৃত কর্মসূচি। মাসের প্রথম দিনেই শুরু হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা। মাসের বিভিন্ন দিনে ইউনিটভিত্তিক পরীক্ষার সময়সূচি অনেক আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষা শেষ হবে ২৩ নভেম্বর। নভেম্বরের ৪ তারিখ থেকে আরম্ভ হবে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) এবং জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা। এ দুটি পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা রয়েছে ২০ নভেম্বর। এ পরীক্ষায় প্রায় ২০ লাখ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করার কথা। অন্যদিকে ২০ নভেম্বর থেকে শুরু হবে দেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে পরিচিত পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী এবং ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। এ পরীক্ষাও চলবে নভেম্বরের ২৮ তারিখ পর্যন্ত। এতে প্রায় ৩০ লাখ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে। ২১ নভেম্বর থেকে দেশের অষ্টম শ্রেণী ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার কথা। এসব পরীক্ষার পরপরই ৭ থেকে ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হবে নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজে ১ম বর্ষ অনার্স কোর্সে ভর্তি পরীক্ষাও ওই সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মেডিকেল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় তো প্রায় প্রতি সপ্তাহেই চলে পরীক্ষা। দেশজুড়ে অবস্থিত সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোয় চলে পুরো বছর ধরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। এসব কলেজেও নভেম্বর ও ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নানা রকমের পরীক্ষা ও সমাপনী মূল্যায়ন কার্যক্রম।

আমাদের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষা অনুষ্ঠানের এসব সময়সূচি পর্যালোচনা করে বলা যায়, নভেম্বর ও ডিসেম্বর হল পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মাস। স্কুল শিক্ষাবর্ষের সমাপনী মাস হিসেবেও এ দুটি মাস অধিক পরিচিত। কাজেই নভেম্বর ও ডিসেম্বরে যদি কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে যদি অস্থিরতা ও সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে দেশের শিক্ষা কার্যক্রম ও পরীক্ষা উভয়ই চরম বিঘ্নের মুখে পড়বে। বিশৃংখলা দেখা দেবে শিক্ষাক্ষেত্রে। রদবদল করতে হবে বিভিন্ন পরীক্ষার সময়সূচি। সব মিলিয়ে প্রায় ৪ কোটি শিক্ষার্থী দুরবস্থায় পড়বে। শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হবে সেটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এসব দিক কি কাউকেই ভাবিয়ে তোলে না?

দেশে যত ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচিই পালিত হোক না কেন, তা যদি শান্তিপূর্ণ হয় তাহলে কারও কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে জনমনে আতংক সৃষ্টি ও শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কোনো শেষ থাকে না। আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নামে যখন নানা ধরনের কর্মসূচি পালন করা হয়, তখন শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় বিঘ্ন ঘটে ব্যাপকভাবে। এমনও দেখা গেছে, স্কুল-কলেজের পাশে স্থাপিত রাজনৈতিক দলের কার্যালয় থেকে মাইক ব্যবহার করে অবিরামভাবে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়া হচ্ছে। পড়ালেখার উপযুক্ত সময়, বিশেষ করে সন্ধ্যার পর এর মাত্রা বেড়ে যায়। এমনকি পরীক্ষার সময়েও চলে মাইকের যথেচ্ছ ব্যবহার। আবাসিক এলাকাও বাদ যায় না এ ধরনের শব্দ দূষণের যন্ত্রণা থেকে। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা কিভাবে শ্রেণীকক্ষে কিংবা নিজের ঘরে বসে পড়ালেখায় মনোনিবেশ করবে সেটা ভাবনার বিষয়। নিরুদ্বিগ্ন মনে ও শব্দহীন পরিবেশে তারা পরীক্ষাই বা দেবে কিভাবে সেটাও গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখা দরকার। এভাবে তো কোনো সভ্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হতে পারে না।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি ও প্রচার-প্রচারণার অংশ হিসেবেই যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশে মাইকের ব্যবহার করা হয় তা নয়। বরং দেখা যায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে হ্যান্ডমাইক ব্যবহার করে একশ্রেণীর হাতুড়ে ওষুধ বিক্রেতা নানা রকমের সুর তুলে তাদের ভাষায় 'সর্বরোগের মহৌষধ'(?) বিক্রির ব্যবসা চালিয়ে যায় বাধাহীনভাবে। মাইক বাজিয়ে ফেরি করে এভাবে ওষুধ বিক্রি করা সম্পূর্ণ বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও তা অব্যাহত রয়েছে। কেউ কেউ স্কুল-কলেজের প্রধান গেটে দাঁড়িয়ে, কখনও বা মাঠে ঢুকে মাইকে গান প্রচার করে আইসক্রিম বিক্রি করছে। কেউ আবার বিভিন্ন ধরনের খেলনাসামগ্রী বিক্রির জন্য মাইকে শিশুদের ডাকাডাকি করছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশে স্থাপিত বাসস্ট্যান্ডে থেমে থাকা বাসের হর্ন কখনও তীব্র আওয়াজ তুলছে, বাসের হেলপাররা যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উচ্চস্বরে হাঁকডাক করছে। কোনো কোনো হেলপার প্রচণ্ডভাবে চিৎকার করে যাত্রীদের ব্যাগ ধরে টানাটানি করছে। প্রতিষ্ঠানের পাশ দিয়ে বিদঘুটে ও কর্কশ শব্দ উৎপাদন করে ট্রাক-বাস চলাচল করছে দ্রুতগতিতে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশে ঘটে যাওয়া এসব কর্মকাণ্ড পড়ালেখায় শিক্ষার্থীদের মনোনিবেশে বাধা সৃষ্টি করে। কখনও কখনও মারাত্মক দুর্ঘটনাও ঘটে থাকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে বাস-ট্রাক না থামানো, দ্রুতগতিতে যানবাহন না চালানো ও হর্ন না বাজানোর নিয়ম থাকলেও বেশিরভাগ চালকই তা মানে না। সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে 'গতি সীমিত', 'হর্ন বাজানো নিষিদ্ধ' ইত্যাদি লেখা সংবলিত সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রেখেই দায়িত্ব শেষ করেছে। আজকাল অবশ্য এ ধরনের সাইনবোর্ডও খুব একটা দেখা যায় না। উন্নত দেশে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কথা কল্পনাও করা যায় না। অথচ আমাদের দেশে এসব দিকে কারও কোনো নজর নেই। এমনকি জনগণের শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় পুলিশ বাহিনীর সামনেও যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশে মাইকের বেআইনি ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণহীন যানবাহন চলাচল করতে দেখা যায়, তখন আমরা বিস্মিত হই। বেআইনি শব্দ সৃষ্টি ও কোলাহল নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তেমন কোনো দৃঢ় ভূমিকা নিতে দেখা যায় না সচরাচর। আবার যারা মাইক ব্যবহার করে তাদের ভাবটা যেন এরকম যে, স্বাধীন দেশে যার যা ইচ্ছা তা-ই করা যাবে। তাদের ধারণা, এসব কাজে বাধা দেয়ার সাধ্য কারও নেই। কোনো সুজন যদি এসব কাজ বন্ধে কিছু বলতে এগিয়ে আসেন, তাহলে তার ওপর চলে সংঘবদ্ধ হামলা।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে কিভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখা যাবে? বছরের শেষ সময়ে এসে পরীক্ষা অনুষ্ঠান নির্বিঘ্ন রাখাই বা যাবে কিভাবে? আমরা শুধু ভাবি, কে আমাদের নিরুদ্বিগ্ন শিক্ষাজীবন উপহার দেবে? জাতীয় উন্নয়নের জন্য এগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলে মনে করি। আমরা জানি না, এসব প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া যাবে কিনা। তবে ধারণা করি, রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপদ জীবনযাপনে এবং শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে, এমন বিরক্তিকর কর্মকাণ্ড না করার ব্যাপারে দেশের আইনে যতই বিধিনিষেধ থাকুক, এসব নিয়ে পত্রপত্রিকায় যতই লেখালেখি হোক, সচেতন মহল থেকে যতই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হোক, তাতে পরিস্থিতির সহসা কোনো উন্নতি হবে বলে মনে হয় না। এটাই আমাদের দুঃখ। কী বিচিত্র এ দেশ! কী বিচিত্র সব কর্মকাণ্ড!

মোঃ মুজিবুর রহমান : সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
mujibur29@gmail.com